# হাজী শরিয়তুল্লা ও দুদু মিয়ার আন্দোলন

**আকবর উদ্দীন**

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

হাজী শরীয়তুল্লাহ

এক

যখন শাহ্ আবদুল আজিজ দিল্লী মহানগরীতে উত্তর ভারতের মুসলমানদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করছিলেন, সেই সময় বাঙলা দেশের মুসলমানেরাও চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর, রাজা রাজভল্লভ, জগৎশেঠ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজা নন্দকুমার প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পলাশীর যুদ্ধে নওয়াব সিরাজদ্দৌলাকে সুবে বাঙলার মসনদ থেকে বিতাড়িত করেছিল। তারপর শুরু হয়েছিল কোম্পানীর শোষণ। লর্ড ক্লাইব থেকে শুরু করে কোম্পানীর ছোট বড় কর্মচারীরা ঘুষ নিয়ে নিজেদের তহবিল ভারি করেছিল, তার উপর কোম্পানীর তহবিলও ভর্তি করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে নওয়াব আলীবর্দী খানের আমলে মারাঠা বর্গীরা বারবার সুবে বাঙলা আক্রমণ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করেছিল এবং প্রজাদের সম্পত্তি বেপরোয়া লুঠ করেছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সুবে বাঙলায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর সেই সঙ্গে মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন চলেছিল। বেনিয়া শ্রেণীর হিন্দুদের সহযোগিতায় ব্যবসা বাণিজ্যের ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানীর ও সেই সঙ্গে হিন্দু বণিকদের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে জমিদারি ও আয়মাদারি সম্পত্তি, লাখেরাজ, ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়। গোড়াতেই সামরিক বিভাগ থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ, পলাশীর যুদ্ধের পর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন সুবে বাঙলার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন কোম্পানীর হাতের পুতুল মীর জাফরের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আশি হাজার মুসলমান সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়। এরাই তখন পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের দূর দূরান্তে জীবিকার অন্বেষণে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এদেরি বংশধরেরা সৈয়দ আহমদ শহীদ, বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী, হাজী শরিয়তুল্লা ও দুদুমিয়া এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে হাজারে হাজারে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল সুবে বাঙলায়। সুবে বাঙলার অর্থে কোম্পানীর তহবিল পূর্ণ হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের অর্থের জোরে উপমহাদেশে কোম্পানীর শাসন বিস্তার লাভ করেছিল। এর জন্য পুরো মাশুল দিতে হয়েছিল সুবে বাঙলার মুসলমানদের। সুবে বাঙলার মুসলমানদের সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং জমিদারী, আয়মাদারি, লাখেরাজ ও ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তার উপর কোম্পানীর আমলে গোড়ার দিকে এই অঞ্চলে যে হাজার হাজার মক্তব, মাদ্রাসা প্রভৃতি মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলিও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

সুবে বাঙলার, বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় এসেছিল মুঘল আমল থেকেই। নানা প্রকার ইসলাম বিরোধী প্রথা, আচার, আচরণ মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যতঃ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংস হয়ে যায়, তখন কাণ্ডারীহীন মুসলমান সমাজে অনৈস্লামিক আচার-আচরণ আরও অধিক পরিমণে প্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে নানা প্রকার হিন্দু কুসংস্কার ও রীতি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দুনিয়ার সর্বত্র মুসলিম সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার ও ধর্ম বিরোধী প্রথা দেখা দিয়েছিল। শাহ্ ওয়ালী উল্লার কথায়, রোমের পতন যুগে রোমানদের মধ্যে যে সকল দুর্নীতি, বিলাসিতা ইত্যাদি দেখা দিয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান তুর্কী সাম্রাজ্যে এবং মুঘল সাম্রাজ্যেও সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

এই পটভূমিতে ও পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের পুনর্জীবনের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র অনুভূত হয়েছিল। মক্কা হচ্ছে চিরকালের বিশ্ব মুসলিম কেন্দ্র। পৃথিবীর সকল দেশ থেকে মুসলমানেরা হজ্জের সময় একবার জমায়েত হয়। সেই সময় মুসলমান আলেমগণও জমায়েত হতেন। তাঁরা সকলেই মুসলমানদের পুনর্জাগরণের বিষয় আলোচনা করতেন। তাঁরা সাব্যস্ত করেছিলেন, মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ আবার সেই স্বর্ণ যুগের মতো বিশুদ্ধ ও অনাবিল করা প্রয়োজন।

শাহ্ ওয়ালী উল্লা দিল্লী মহানগরীতে সেই কার্য আরম্ভ করেছিলেন।

তাঁর পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ পরে যখন সংস্কার ও সেই সঙ্গে জেহাদের বাণী প্রচার ও কার্যকরী করার ব্যবস্থা অবলম্বন করছিলেন, সেই সময় বাঙলার ফরিদপুরের হাজী শরিয়তুল্লা ও চব্বিশ পরগনার মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমীর এই অঞ্চলেও সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

দুই

ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার শামাইল গ্রামে হাজী শরিয়তুল্লা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও ইনতিকালের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা যায় না। তবে, অনুমান করা যায় যে, আন্দাজ ১৭৭১ খৃস্টাব্দে (কারো কারো মতে ১৭৮০ বা ১৭৮১ সালে) তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং ১৮৪০ সালে তাঁর ইনতিকাল হয়।

জনৈক আধুনিক লেখকের মতে আঠারো বছর বয়সে তিনি হজ্জ ব্রত সম্পাদনের জন্য মক্কা গিয়াছিলেন এবং প্রায় কুড়ি বৎসরকাল মক্কার শাফেয়ি মজহাবের তদানীন্তন প্রধান শেখ তাহের আস-সম্বল আল মক্কির শিষ্যরূপে ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। ১৮০২ খৃস্টাব্দের দিকে তিনি দেশে ফিরে আসেন। কোন কোন লেখকের মতে তিনি ১৮২০ খৃস্টাব্দে দেশে ফিরেছিলেন। শেষোক্ত মত ভ্রান্ত বলে মনে হয়। এই পর্যন্ত বলা যায় যে ১৮০২ খৃস্টাব্দের পর তিনি বোধ হয় দ্বিতীয়বার হজ্জ করেছিলেন।

কথিত হয় যে, দেশে ফেরার পথে তিনি দস্যুদের কবলে পড়েছিলেন। ডাকাতেরা তাঁর সমস্ত বই-পুস্তক ও সঙ্গের অন্যান্য দ্রব্যাদি লুট করে ও তাঁকে দলে যোগ দিতে বাধ্য করে। অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় তিনি বাধ্য হয়ে ডাকাতদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সরল জীবনযাত্রা ও গভীর ইমান দেখে দস্যুরা ডাকাতি ছেড়ে তাঁর অত্যন্ত অনুরক্ত শিষ্য হয়েছিল।

এরপর হাজী শরিয়তুল্লা বন্দরখোলা গ্রামে এসে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিং, নদীয়া জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তার হয়। এই সকল অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী তাঁর অনুসারী হয়। পরে প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য তিনি বন্দরখোলা থেকে ঢাকা জেলার নয়াবাড়ীতে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

সম্ভবতঃ হাজী শরিয়তুল্লা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বন্দরখোলায় প্রচার কার্য আরম্ভ করেছিলেন। বাঙলার বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে সর্বপ্রকার ইসলাম বিরোধী প্রথা, আচার, আচরণ ইত্যাদি দূর করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। এ সময় হিন্দুদের মতো মুসলমান সমাজেও গুরুগীরি-চেলাগীরি, অর্থাৎ পীর-মুরিদি, খোনকারি, কবরপূজা, হোলি ও দুর্গাপূজায় যোগদান, বিবাহে পণপ্রথা, মহরম উৎসব পালন ইত্যাদি নানা প্রকার প্রথা দেখা দিয়েছিল। বহু তথাকথিত পীর এবং বাউল, ন্যাড়ার ফকির ইত্যাদির কবলে পড়ে মুসলমানেরা বহু ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

> এই সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে শরিয়তুল্লা তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি পীর ও মুরিদ শব্দের পরিবর্তে ওস্তাদ ও শাগরেদ শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। তিনি কোন পীরের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণের বিরোধী ছিলেন। প্রত্যেক শাগরেদকে অতীত পাপকার্যের জন্য তওবা করতে ও ভবিষ্যতে আল্লার অনুমোদিত পথে ধার্মিক জীবন যাপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; পীর ও কবর পূজা নিষিদ্ধ করেছিলেন; পৌত্তলিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কার্য ও উৎসবে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। উল্লেখ থাকে যে, তৎকালে হিন্দু জমিদারগণ দুর্গাপূজা ও অন্যান্য পূজা উপলক্ষে মুসলমান প্রজাদের নিকট অর্থ আদায় করতেন।

তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর অনুসারীরা সকলে সমান ও এক ঐক্যবদ্ধ জমা-আতভুক্ত। সেই হেতু, তাদের মধ্যে কেউ বিপন্ন হলে অন্য সকলে তাকে সাহায্য করতে বাধ্য।

হাজী শরিয়তুল্লা আরো ঘোষণা করেছিলেন যে, যেহেতু একমাত্র মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রে ঈদ ও জুম-আর নামাজ সিদ্ধ, এবং যেহেতু সুবে বাঙলা মুসলিম রাষ্ট্র নয় সেই হেতু এখানে উক্ত নামাজ পড়া সিদ্ধ নয়।

হাজী শরিয়তুল্লার এই আন্দোলনকে ফারাজী আন্দোলন রূপে অভিহিত করা হয়। হাজী সাহেবের কোন কোন মতের সঙ্গে অন্য আলেমদের মতবিরোধ আছে। কিন্তু তাঁর এই সংস্কার আন্দোলনের ফলে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যে এক নবজীবনের উন্মেষ হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাঙালী মুসলমানেরা যে দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

তিন

হাজী শরিয়তুল্লার এই আন্দোলন গোড়ায় ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের অন্দোলন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এক শ্রেণীর মুসলমান এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। হাজী সাহেবের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পীর সাহেব ও তথাকথিত আলেমদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস হতে থাকে। নিরক্ষর পল্লীবাসীরাও চিরাচরিত সামাজিক প্রথা সমূহ ত্যাগ করতে হবে বলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তদুপরি, হাজী শরিয়তুল্লার অনুসারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের নিজেদের দলভুক্ত করার জন্য জোর জুলুম করতে থাকে।

এতদসত্ত্বেও হাজী শরিয়তুল্লার অনুসারীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধ বাধলো হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের সঙ্গে। ফারাজীদের একতা দেখে এরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং অন্তরাল থেকে ফারাজী-বিরোধী মুসলমানদের উৎসাহ দিয়েছিলেন।

১৮৩১ খৃস্টাব্দে ফারাজী ও ফারাজী-বিরোধীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। উভয় পক্ষ মারামারি, হাঙ্গামা, লুঠপাট করেছিল। আদালতের বিচারে হাজী শরিয়তুল্লার দলের দুজনের এক বৎসরের সশ্রম কারাবাস ও দু শ টাকা করে জরিমানা হয়েছিল; আরো কয়েকজনের একশ টাকা করে জরিমানা হয়েছিল। হাজী সাহেবের বিরুদ্ধে প্রমাণ না থাকায় ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কেবল মুচলেকা নিয়ে তাঁকে খালাস দেন।

এই ঘটনার ফলে হাজী শরিয়তুল্লা ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী থেকে কেন্দ্র আবার ফরিদপুরের বন্দরখোলা গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। এর পর তিনি অত্যন্ত সাবধানে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। সম্ভবতঃ ঊনিশ শতকের চতুর্থ দশকের কোন সময় তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল। হাজী শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ মোহসেন ওরফে দুদু মিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিষয় পরে বলা হবে। বন্দরখোলা গ্রামের এক সাধারণ পরিবারের জন্ম গ্রহণ করে হাজী শরিয়তুল্লা এক সুদূরপ্রসারী সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। হিন্দু পৌত্তলিকতার সংস্পর্শে এসে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যে সকল অনৈস্লামিক প্রথা ও কুসংস্কার শিকড় গেড়েছিল, সেগুলির বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শুধু প্রতিবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। মতবিরোধ যাই থাক, এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর সহজ, সরল, আন্তরিকতাপূর্ণ, ইমানদারী জীবনযাত্রা দেখে হাজার হাজার মুসলমান তাঁর অনুসারী হয়েছিল। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে বলা হয়েছে যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁকে পিতার মত শ্রদ্ধা করতো, তিনি তাদের দুর্দিনে পরামর্শ দিতেন এবং দুঃখে সান্ত্বনা দিতেন। অস্বীকার করার উপায় নাই যে, দ্রুত অধঃপতনমুখী মুসলমান সমাজ আবার যেন আত্মস্থ হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল; নির্জীব মুসলমান আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। এই কারণেই সৈয়দ আহমদ শহীদ ১৮২১ সালে যখন কলকাতায় আসেন তখন চট্টগ্রাম থেকে চব্বিশ পরগণা এবং চব্বিশ পরগণা থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত সকল অঞ্চলের বহুসংখ্যক মুসলমান মুজাহিদ সীমান্তের মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করেছিল।

দুদু মিয়া

চার

হাজী শরিয়তুল্লার ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ মোহসিন ওরফে দুদু মিয়া ফারাজী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

কোন কোন লেখকের মতে দুদু মিয়ার জন্ম হয়েছিল ১৮১৯ খৃস্টাব্দে। কিন্তু এই কাল নির্ণয় ঠিক কি না সে বিষয়ে সন্দেহের

অবকাশ আছে। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, এ বিষয়ে মতানৈক্য নাই। সুতরাং দেখা যায় যে, মাত্র ৪১/৪২ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু অন্যসূত্রে প্রকাশ, ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবের সময় তাঁকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সিপাহী বিপ্লবের হাঙ্গামা মিটে যাওয়ার পর বাঙলা প্রদেশের তদানীন্তন প্রধান শাসনকর্তা জেলখানা পরিদর্শন কালে শ্বেতশ্মশ্রু ও কেশ সমন্বিত এক বৃদ্ধকে দেখে কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারেন যে, ইনিই দুদু মিয়া। একচল্লিশ বা বিয়াল্লিশ বছরের ব্যক্তির এ রকম চেহারা হতে পারে না। তা ছাড়া ১৮৩৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে দস্যুতা ও ঘর জ্বালানির এক মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতে দায়ের হয়েছিল। ১৮১৯ খৃস্টাব্দে জন্ম হলে, এই মোকদ্দমার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ঊনিশ বছর। অথচ ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর পিতার স্থান অধিকার করে বিপুল প্রতিপত্তিশালী হয়েছিলেন, একথা বেশ কিছুটা অবাস্তাব মনে হয়। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে মনে হয়, ঊনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে হাজী শরিয়তুল্লা ১৮০২ সালে মক্কা থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরে (১৮০৪/৫ হতে পারে) দুদু মিয়া জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

দুদু মিয়া তাঁর পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং অল্প বয়সে-সম্ভবতঃ হাজী শরিয়তুল্লা যখন দ্বিতীয়বার মক্কা যান সেই সময় হজ্জব্রত সম্পন্ন করেছিলেন।

১৮৩১ সালে হাজী শরিয়তুল্লা ও তাঁর অনুসারীদের ফৌজদারি মোকদ্দমা হওয়ার পর হাজী সাহেব বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। এই সময় থেকেই দুদু মিয়া আন্দোলনকে জোরদার করে প্রতিষ্ঠানকে মজবুত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ-কাজে তিনি এত বিপুল সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই ফারাজী আন্দোলন পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

সংগঠনের ক্ষেত্রেই তিনি সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছিলেন। সমগ্র পূর্ববঙ্গকে তিনি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে এক একজন খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

> হাজী শরিয়তুল্লার আমলে যে আন্দোলন কেবল ধর্ম-সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, দুদু মিয়ার আমলে তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে পিতার সঙ্গে দুদু মিয়ার মতের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কেবল ওস্তাদ ও শাগরেদ সম্পর্কের বদলে তিনি পীর ও মুরিদি প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। মুরিদগণের ধারণা ছিল যে, তাঁর খোদাদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা আছে। অনুসারীদের মধ্যে সাম্য ও একতা যাতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় সে দিকে তিনি ও তাঁর খলিফাগণ বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। বিপন্ন মুরিদদের সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া অন্য সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। তাঁর উৎসাহী মুরিদেরা দলভুক্ত করার জন্য মারধর ও জুলুম করতো। সে কথা পরে বলা হবে। প্রকৃত পক্ষে যারা তাঁর দলে যোগ দিত না, তাদের উপরই জুলুম চলতো। দুদু মিয়ার বাড়ীর দুয়ার সকলের জন্য ছিল অবারিত। যে-কোন ব্যক্তি সেখানে গিয়ে আহার ও বিশ্রাম করতে পারতো।

কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের বিরোধ উপস্থিত হয়। ফলে, কোম্পানীর তৎকালীন শাসকদের সহযোগিতায় নীলকর ও জমিদারেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে বহু মামলা মোকদ্দমা করে।

পাঁচ

উপরোক্ত বিরোধের কারণ বুঝতে হলে তৎকালীন পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। নওয়াবী আমল কার্যতঃ শেষ হয়ে গিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা চলে গিয়েছে। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত এবং পরবর্তীকালের সূর্যাস্ত আইন, ওয়াকফ ধ্বংসনীতি ইত্যাদির ফলে বাঙলা দেশে এক নতুন হিন্দু বেনিয়া জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। তার উপর ইংরেজ নীলকরদের আবির্ভাব হয়েছে। প্রত্যেক জেলায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর ও জজ এবং দেশী পুলিশ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কয়েকটি শহরের বাইরে শাসন ও বিচার, শান্তি ও শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। জমিদার শ্রেণী নিজেরাই ছিল ডাকাতের সরদার। প্রজাদের নিকট থেকে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে বে-আইনী পন্থা অবলম্বন করতে তাদের সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না। বিভিন্ন পূজায়, পুত্র-কন্যার অন্নপ্রাশনে, পৈতায়, বিবাহে এমন কি অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জমিদারেরা প্রজাদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করত। কোন প্রজা অর্থ না দিলে তাকে ধরে এনে তার উপর নির্মম অত্যাচার করা হত। মারধর ছাড়াও অত্যাচারের আর একটি পন্থা ছিল, দুজন প্রজার দাড়ি একত্রে বেঁধে নাকে লঙ্কার

গুঁড়ো দেওয়া হত। এর ফল সহজেই অনুমেয়।

অন্যদিকে ইংরেজ নীলকরদের খৃষ্টান ও হিন্দু কর্মচারীরা হুজুরের হুকুম মোতাবেক প্রজাদের ভাল আবাদী জমি নীল চাষের জন্য দখল করত। কোন প্রজা স্বেচ্ছায় জমি দিতে রাজী না হলে, তার উপর অমানুষিক অত্যাচার ত হতই, উপরন্তু তাদের নির্মমভাবে মারধর করা হত; নীলকর ও বহু জমিদারের কবল থেকে পল্লীর সুশ্রী যুবতীদের উদ্ধার পাওয়ার উপায় ছিল না। অবশ্য এই প্রকার অত্যাচার যে হিন্দু কৃষকদের উপর হত না, তা নয়। সাধারণভাবে হিন্দু কৃষকেরা ছিল নিম্নশ্রেণীর এবং কর্তার বা হুজুরের হুকুম মাথা পেতে নেওয়া তাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু জমিদারগণ তাই তাদের অল্পে রেহাই দিতেন। নীলকররা অবশ্য কাউকেই রেহাই দিত না। কিন্তু মুসলমান কৃষকদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় অত্যাচারের প্রকোপ তাদের উপরই বেশী পড়েছিল।

তৎকালীন মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার কিছুটা ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। ইসলামের মুলনীতি বিরোধী বহু প্রথা ও আচার-আচরণ মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল। অভিজাত সমাজও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। ইসলাম খাঁ, শায়েস্তা খাঁ থেকে মীর জুমলা পর্যন্ত প্রত্যেক মুঘল সুবেদার রাজকার্যে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, ধর্মীয় বা সামাজিক ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর থাকতো খুবই কম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুবে বাঙলায়, অর্থাৎ বাঙলা ও বিহারে নানা কারণে অনৈস্লামিক প্রথাসমূহ সমাজে প্রবেশ করেছিল। পীরপূজা, শিবপূজা এমনকি মনসাপূজায় অংশগ্রহণ করতেও বহু মুসলমান সঙ্কোচ বোধ করত না। আলীনগরের সন্ধির পর নওয়াব সিরাজদ্দৌলা মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে গিয়ে হোলি খেলা করেছিলেন। নওয়াব মীরজাফর গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার করে হোলি উৎসব পালন করেছিলেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তিনি মৃত্যুর পূর্বে কিরীটেশ্বরী প্রতিমার পাদোদক পান করেছিলেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, বাহাত্তরের মন্বন্তর, কোম্পানী ও নতুন ভূঁইফোঁড় বেনিয়া জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার, চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা, সূর্যাস্ত আইন ও রিজাম্পসন আইন প্রভৃতির কল্যাণে এবং সর্বোপরি প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় সুবে বাঙলা বিশেষতঃ বাঙলার পল্লী অঞ্চল থেকে শিক্ষিত মওলবী, মওলানার সংখ্যা প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। অথচ ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রধানতঃ কলকাতা ও নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের পক্ষে নতুন শিক্ষা গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না। তাই এরা শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়েই রইলো। ফলে পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত বাউল, ন্যাড়ার ফকির, খোনকারদের প্রাধান্য দেখা দিল। এই সকল অশিক্ষিত মোল্লার দল তাই শরিয়তুল্লা ও দুদু মিয়ার আন্দোলনের দুশমন হয়ে দাঁড়ালো। মূলতঃ নিজেদের স্বার্থহানির আশঙ্কায় এরা সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। কেবল বিরোধিতা করলেও হয়তো কথা ছিল না। পরন্ত এরা জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

ছয়

> পূর্ব-বর্ণিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দূদু মিয়ার আন্দোলন ধর্ম সংস্কারের পর্যায় অতিক্রম করে অর্থনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে উপনীত হয়। দুর্গাপূজা ও পৌত্তলিকতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানে চাঁদা দেওয়া ও অংশ গ্রহণ করা হারাম বলে দুদু মিয়া ঘোষণা করেন। তাছাড়া, জমিদারগণ কর্তৃক বেআইনী কর ও অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য তিনি তাঁর অনুসারীদের কঠোর নির্দেশ দেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ভূমির মালিক আল্লাহ, ব্যক্তি বিশেষ নয় এবং ভূমির বাবদ কর আদায়ের অধিকার ব্যক্তি বিশেষের নাই। নীলকরদেরও জোর করে কারো জমি দখল করার অধিকার নাই। তিনি কৃষকদের সহকারী খাস জমিতে বসতি স্থাপন ও চাষাবাদ করার উপদেশ দেন, তাতে কেবল সরকারকে ভূমিরাজস্ব দেওয়া ছাড়া জমির জন্য অন্য কোন কর দিতে হবে না।

জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকরা দুদু মিয়ার দলে যোগ দিয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর কিছু সংখ্যক হিন্দু তাঁর দলে যোগদান করেছিল। এমন কি, তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের মধ্যেও কয়েকজন হিন্দুর নাম পাওয়া যায়। দুদু মিয়ার তখন বিপুল প্রতাপ। জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে দুদু মিয়ার অধীনে প্রায় আশি হাজার কর্মী ছিল। পরবর্তীকালে ১৮৫৭ সালে যখন তাঁকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করা হয়, তখনও তিনি নাকি বলেছিলেন, তাঁর এক ডাকে পঞ্চাশ হাজার লোক জমায়েত হবে। এই জন্যই তাকে খালাস দেওয়া হয় নাই।

যাই হ‌ক, দুদু মিয়ার নির্দেশ মোতাবেক তাঁর অনুসারীরা সর্বপ্রকার অন্যায়, অবৈধ ও ধর্ম-বিরোধী কর ও চাঁদা দিতে অস্বীকার করে। অনেকে নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকারী খাস জমিতে বসতি স্থাপন ও চাষাবাদ আরম্ভ করে।

জমিদার ও নীলকরেরা তখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আর জেলার ইংরেজ শাসকেরা নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করবে তাতে সন্দেহ করার কারণ নাই। এইরূপে যা আরম্ভ হয়েছিল কেবল ধর্মীয় আন্দোলন রূপে, তাই পর্যবসিত হ্ল অর্থনৈতিক সংগ্রামে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে পূর্ব বাঙলার কৃষকেরা যে আন্দোলন শুরু করেছিল, এক শতাব্দীরও অধিককাল বংশ পরম্পরায় তারা সেই সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। আজও যে তাদের সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে, একথা নিশ্চিত বলা যায় না।

দুদু মিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর অনুসারীরা সর্বপ্রকার অন্যায়, অবৈধ ও ধর্মবিরোধী কর দিতে অস্বীকার করার ফলে জমিদার ও নীলকরেরা একযোগে তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করে। ১৮৩৮ খৃস্টাব্দের দিকে জনৈক নীলকর প্রায় ৭/৮শ সশস্ত্র পাইক ও লাঠিয়াল সহ দুদু মিয়ার বাড়ী আক্রমণ করে লুটতরাজ করে ও পুড়িয়ে দেয়। তারা তাঁর প্রায় বারো লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুট করেছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ এর কোন প্রতিকার করে নাই। নীলকর পুলিশকে ঘুষ দিয়ে হাত করেছিল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরের সঙ্গে খানা খাওয়ার পর, অর্থাৎ ইংরেজ নীলকরের প্ররোচনায় ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট বিনা তদন্তে দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে আদালতে বিচারের জন্য (অথবা শাস্তি দেওয়ার জন্য) পাঠিয়ে দেয়। উল্টো দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে লুটতরাজের অভিযোগ আনা হয়। ১৮৪৪ সালে অনধিকার প্রবেশ ও বেআইনী জমায়েত হওয়ার অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। আবার ১৮৪৬ সালে মানুষ গুম ও লুটতরাজের অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রমাণাভাবে প্রতিটি মোকদ্দমায় তিনি খালাস হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল যে, কেউ তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হ্ত না। সরকারের নিকট বারবার আবেদন করা স্বত্ত্বেও সুবিচার না পাওয়ায় এই সময় তিনি নিজস্ব এলকার সকল বিরোধের বিচার নিজেই করতেন। হিন্দু বা মুসলমান যে কোন ব্যক্তি কৃষকের নিকট খাজনা আদায়ের জন্য তাঁর নিকট বিচার প্রার্থী না হয়ে আদালতে নালিশ করলে, তিনি তাকে শাস্তি দিতেন। দূর দূরান্তের পল্লী অঞ্চলেও দুদু মিয়ার হুকুমই ছিল একমাত্র হুকুম।

বারবার অত্যাচারিত হওয়ায় অথচ সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন স্বত্ত্বেও সুবিচার না পাওয়ার ফলে, দুদু মিয়া দুশমনদের উচিত শিক্ষা দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাঁচচুর নীলকর কাছারির মালিক ডানলপের সাহায্যে অন্যান্য জমিদারগণ অবাধে অত্যাচার করতেও মামলা মোকদ্দমা চালাতে সক্ষম হ্ত। সেই জন্য তিনি সর্বাগ্রে ডানলপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার মনে করেছিলেন। ১৮৪৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁর লোকেরা ডানলপের কাছারি পুড়িয়ে দেয়; ডানলপের সকল দুষ্কর্মের প্রধান সহকারী কর্মচারী হিন্দু গোমস্তাকে হত্যা করে এবং সেই সঙ্গে আরও কয়েকজনের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। এই ঘটনা সম্পর্কিত মোকদ্দমা বহুদিন চলেছিল। বহু সাক্ষী সাবুদ লওয়ার পর ফরিদপুরের জজ দুদু মিয়া ও তাঁর বাষট্টিজন অনুসারীকে দণ্ড দেন। সদর আদালতে আপীল করার ফলে দুদু মিয়া খালাস পান, কিন্তু কিছু সংখ্যক আসামীর দণ্ড বহাল থাকে।

সাত ১৮৪৬ সালের মোকাদ্দমা প্রায় দুবছর চলেছিল। এই মোকদ্দমায় শেষ পর্যন্ত দুদু মিয়া খালাস হলেও তাঁর এবং তাঁর আন্দোলনের উপর সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়েছিল। তবু তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস হয় নাই। কারণ এই সময় একদিকে বৃটিশ শাসকবর্গ যেমন তাদের অধিকার বিস্তার করছিল, অন্যদিকে বাঙলায় জমিদার বিশেষতঃ নীলকরেরা সুযোগ লাভ করে প্রজাদের উপর আরও অধিক অত্যাচার করছিল।

এই সময় অর্থাৎ ১৮৫০ সালের দিকে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অন্যদিকে হচ্ছিল। ১৮৩১ খৃস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান নেতৃবৃন্দ শহীদ হলেও প্রকৃত পক্ষে সংগ্রামের সমাপ্তি হয় নাই। বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদ হওয়ার অল্পকাল পরে পাটনার মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলী নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মওলানা বেলায়েত আলীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এই বাঙলা অঞ্চল।

ইংরেজ সরকার দুদু মিয়ার কৃষক আন্দোলনকে মওলানা বেলায়েত আলীর সংগ্রামী আন্দোলনের অংশরূপে গণ্য করেছিল। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ড্যাম্পিয়ার তার উপরওয়ালাদের নিকট রিপোর্ট করে যে, তদানীন্তন শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ইংরেজ বিতাড়ন করে মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠাই ফারাজীদের উদ্দেশ্য এবং সেই কারণে ফারাজীদের নেতা দুদু মিয়াকে নির্বাসিত করা দরকার। সরকার ড্যাম্পিয়ারের উক্ত সোপারেশ অনুমোদন করেন নাই। দুদু মিয়া তখন আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজ বিতাড়ন দুদু মিয়ার উদ্দেশ্য ছিল, বা তিনি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আন্দোলন করছিলেন, একথা নিশ্চিত বলা যায় না। ১৮৫০ সালের দিকে উত্তর ভারতে অন্ততঃ সুবে বাঙলায় ইংরেজ শাসন প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান জমিদারেরা ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করছিল। নতুন ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণী হিন্দুদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এরা ইংরেজের শাসন ব্যবস্থাকে পূর্ণ সমর্থন করছিল। এই পরিস্থিতিতে দুদু মিয়ার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করবেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রকৃতপক্ষে, তিনি জমিদার, মহাজন ও নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহায় দরিদ্র কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই মওলানা বেলায়েত আলী পরিচালিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সংগ্রামী আন্দোলনের সঙ্গে দুদু মিয়ার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু বিরোধী ছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় না। সুবে বাঙলায় তখন সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার সুযোগ সম্ভাবনা ছিল না একথা দুদু মিয়ার নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সময় ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লুটতরাজ, হাঙ্গামা করা ইত্যাদি অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু তখনো তাঁর প্রভাব এত বেশী ছিল যে, মোকদ্দমায় উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে মামলায় তাঁকে দণ্ড দেওয়া অসম্ভব দেখে, সিপাহী বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্ধী করে রাখা হয়। প্রায় দু□তিন বৎসর জেলে বন্দী থাকার পর তাঁকে খালাস দেওয়া হয়।

১৮৬০ খৃস্টাব্দে তাঁর ইন্তিকাল হয়। ঢাকায় মাহুতটুলিতে তাঁর নশ্বর দেহ দাফন করা হয়েছিল। মুহম্মদ মোহসিন ওরফে দুদু মিয়ার আন্দোলনকে সৈয়দ আহমদ শহীদ ও মওলানা বেলায়েত আলীর সশস্ত্র সংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুবে বাঙলার তৎকালের পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব ছিল না। দুদু মিয়ার আন্দোলন ছিল নিপীড়িত সাধারণ মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। যদিও ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে এই আন্দোলনের আরম্ভ হয়েছিল, তথাপি শেষ পর্যন্ত দুদু মিয়াকে হিন্দু জমিদার, ইংরেজ নীলকর ও হিন্দু মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হ□য়েছিল। ইংরেজ সরকার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইংরেজ নীলকরদের পক্ষ সমর্থন ত□করতই, তা ছাড়াও হিন্দু জমিদার ও মহাজনদেরও সমর্থন করত। ১৭৫৭ থেকে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কেবল মুসলমানেরাই ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে। আর লক্ষণীয় যে মুসলমানদের সংগ্রাম নওয়াবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের সংগ্রাম ছিল সাধারণ মানুষের সংগ্রাম। সেই কারণে ইংরেজ সরকারী কর্তৃপক্ষ কেবল মুসলমানদের দুশমন গণ্য করত। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবে নানা সাহেব, ঝান্সীর রাণী ও তাতিয়া টোপি প্রমুখ কয়েকজন হিন্দু রাজা বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন সত্য; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী এই বিপ্লব ছিল মূলতঃ ও প্রধানতঃ মুসলমানদের বিপ্লব এবং এরা ছিল সাধারণ মুসলমান, আমীর ওমরাহ নওয়াব নয়।

সুত্রঃ 'বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র' প্রকাশিত □ফরায়েজী আন্দোলনঃ আত্মসত্তার রাজনীতি□ গ্রন্থ

আকবর উদ্দীন